# রবীন্দ্রনাথ ও চীন সংস্কৃতি চর্চা

অশোক কুমার রায়

ভারত ও চীনের সহযোগিতায় বৌদ্ধযুগে যে বিরাট সাহিত্য ও শিল্প প্রায় হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠে সেটি পৃথিবীর ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। কিন্তু, মধ্যযুগের অস্থির ও অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে চীন ও ভারতের মধ্যে নিবিড় যোগ-সূত্রটি ছিন্ন হয়ে যায়। তবু আমরা দেখি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায় চীনের প্রাচীন কন্‌ফুসিও ধর্ম ও নীতির উদারতার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে যুগের অতি অনুদার খৃষ্টিয় পাদ্রীদের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে! তার অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে দেখি রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ''তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় কন্‌ফুসিও ধর্ম ও তাও ধর্ম সম্পন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করে ভারতবাসীকে চীনের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার বিষয়ে সচেতন করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে বিলাত পাঠাবার একবছর পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা সারাদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও একজন অনুচর সঙ্গে করে ১৮৭৭ সালের শরৎ কালে চীন যাত্রা করেন। বর্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর ও হংকং পরিদর্শন করে তিনি দক্ষিণ চীনের মর্মস্থল ক্যান্টন পর্যন্ত গিয়েছিলেন ও সেখানকার বৌদ্ধ মঠ ও মন্দিরাদি দেখে ১৮৭৭ সালের ''ভারতী'' পত্রিকায় চীন সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধের অবতারণা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই আলোচনা বেশী দূর অগ্রসর হয়নি এবং রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের রোজনামচা ও অন্যান্য কাগজপত্র প্রকাশিত হবার সুযোগ পায়নি। প্রথম বিলাত ভ্রমণের পর দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথ ১৮৮১ সালের ''ভারতী''তে আধুনিক চীনের জীবন মরণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা তোলেন ''চীনে মরণের ব্যবসায়'' শীর্ষক প্রবন্ধে।। আবার দেখি স্বদেশীযুগে রবীন্দ্রনাথ যখন ''নব পর্যায় বঙ্গ-দর্শনে'র সম্পাদক তখন তিনি লাউস ডিকিনসন্ রচিত ''Letters of John Chinaman'' এর সমালোচনা প্রসঙ্গে চীন সভ্যতার মূল ভিত্তি ও আদর্শ নিয়ে গভীর আলোচনা করেন তাঁর ''চীনেম্যানের চিঠিতে' (১৯০৫-১৯০৬)। তার আগেই রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ চৈনিক শিল্পের মর্মকথা শোনেন জাপানী শিল্প-রসিক ওকাকুরা কাকুজোর সঙ্গে বন্ধুত্বের ভিতর দিয়ে। জাপানী হলেও তিনি ছিলেন চীন-শিল্পের একজন বড় সমঝদার এবং তার পরিচয় তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর ''Ideals of the East''এবং ''The Book of Tea'' নামক দু'খানি অপূর্ব গ্রন্থে। ওকাকুরা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাবোধি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপালের বন্ধু এবং তাঁদের সঙ্গে বুদ্ধগয়া, নালন্দা, সারনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থান ও বৌদ্ধ শিল্পকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করবার জন্যে ওকাকুরা ভারতবর্ষে ১৯০১-০২ সাল কাটান। এই সময়েই অবনীন্দ্রনাথের তুলিকায় ফুটে ওঠে তাঁর দুখানি অমর চিত্র ঃ ''বুদ্ধ ও সুজাতা'' ও ''ভারতমাতা।'' আমাদের স্বদেশী যুগের সেই উষাকলে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ, ওকাকুরা ও নিবেদিতা, ভারত তথা চীন ও পূর্ব এশিয়ার নব জাগরণে কত বড় সাহায্য করেছেন তা আমাদের জনসাধারণকে এখনও ভাল করে বোঝান হয় নি। ১৯১১ সালে যখন আমরা রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছরের জন্মোৎসব করি, ঠিক সেই বছরেই প্রাচীন চীনের নব জীবনের সূচনা হোলো প্রথম চৈনিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়। ১৯১৩ সালে কবির ললাটে নোবেল প্রাইজের বিজয় মুকুট এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ''গীতাঞ্জলি'' ও অন্যান্য রচনার অনুবাদ হতে আরম্ভ হোলো চীন সাহিত্যিকদের হাতে। তাঁরা অনেকে কবি অভিনন্দন জানান ১৯১৬-১৭ সালে তাঁর প্রথম পূর্ব-এশিয়া পার হয়ে আমেরিকা যাবার পথে। ১৯২১ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর ভিত্তি পত্তন করেন তখন তিনি বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করেন চীন ভাষাবিদ্ ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভীকে। তিনিই প্রথম শান্তিনিকেতনের চীন ও সংস্কৃত ভাষার তুলনামুলক আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং ক্রমশ পণ্ডিত-প্রবর বিধুশেখর শাস্ত্রী, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রভৃতি তাঁদের গবেষণার ভেতর দিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ যেন নূতন করে স্থাপন করেন। ১৯২৩ সালের শেষে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শেষ করে যেদিন শান্তিনিকেতনে কবিগুরুকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে বক্তৃতাদির জন্য। তাঁর সঙ্গে ১৯২৪ সালে চীন ও পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ করবার সুযোগ যে কবিগুরু আমাকে দিয়েছিলেন সে কথা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে চিরদিন স্মরণ করবো। সেই ভ্রমণের ফলেই আমাদের বৃহত্তর ভারত পরিষদের প্রতিষ্ঠা এবং রবীন্দ্রনাথ আমাদের আজীবন পৃষ্ঠপোষক ও ''পুরোধা'' ছিলেন। ১৯২৭ সালে কবি

আবার যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও শ্যামরাজ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার অভিযান করেন এবং সেই সময় কবির একজন চীনাভক্ত তান্‌ইভন্‌ সান্‌ কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁকে জানান যে, শান্তিনিকেতনে চীন - ভারতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করতে চান। কবির আশীর্বাদ নিয়ে অধ্যাপক তান্‌ ইউন্‌ সান্‌ কাজ আরম্ভ করেন এবং দশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৯৩৭ সালে শান্তি নিকেতন চীন ভবনের প্রতিষ্ঠা করেন। চীনা ও তীব্বতী ভাষার অনেক বহুমূল্য গ্রন্থ এখানে সঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যদি কোনদিন চীনভাষা শিক্ষা করেন চীন দেশবাসীর মর্মস্থলে আবার প্রবেশ করতে চান তাহলে তাঁদের শান্তিনিকেতনে কিছুদিন শিক্ষানবীশি করতে হবে। ওখানকার কলাভবনেও চৈনিক চিত্রকলার অনেক বহুমুল্য নিদর্শন ছাত্রেরা পাবেন, সেগুলি মনীষী নন্দলাল বসু মহাশয় সযত্নে রক্ষা করে আসছেন এবং কলাভবনে ছাত্রদের ভেতর দিয়ে চীন ও ভারতীয় রীতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছেন। ১৯৩৪ সালের মধ্যে অধ্যাপক তান্‌ কবির চীন ভক্তদের কাছ থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা আসে। কিন্তু টাকার চেয়ে মূল্যবান আমাদের চীনা বন্ধুদের প্রাণে সাড়া। কবির ৭০ বছরের জন্মোৎসবে (১৯৩১-৩২) এই সাড়া পাই Golden Book of Tagore -এর মধ্যে তাঁর চীনাভক্তদের অর্ঘ্যদানে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখি একদল চীনাশিল্পী বাংলা দেশে আসেন ও শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যকলা সমিতিতে তাঁদের চিত্রাদির প্রদর্শনী খোলেন। আর একজন বড় চিত্রকর Jupoen ১৯৪০ সালে আসেন ও কবিগুরু একখানি উঁচু দরের প্রতিকৃতি কলাভবনে উপহার দেন। চৈনিক বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রধান আচার্য্য Tai Ksu (রেভা টাই সু) যিনি কবিকে ১৯২৪ সালে তাঁদের সঙ্গে সম্বর্দ্ধনা করেন, তিনিও ১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ তীর্থগুলি পরিদর্শন করে কবিকে আবার অভিনন্দন করে যান। কবির তিরোধানের কয়েক মাস মাত্র আগে মান্যবর Taichi Tao ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কবির রোগ-শয্যার পাশে চীন জাতীয় কৃতজ্ঞতা ও চরম শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেই উপলক্ষ্যে তিনি শান্তিনিকেতনের সপ্তপর্ণী বৃক্ষের নীচে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনপীঠ সংস্কারের জন্য ১০,০০০ টাকা দান করেন।

কবির তিরোধানের পর মার্শাল চিয়াংকাইশেক ও তাঁর সহধর্মিনী ভারতবর্ষে পদার্পণ করেই পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আসেন (ফেব্রুয়ারী ১৯৪২)। অমর কবির আসন তখন শূন্য কিন্তু তাঁর সাধনা - ভাবনা যে বিশ্ব - মানবের সম্পত্তি সেটি তিনি গভীর ভাবে অনুভব করেন এবং কবির স্মৃতি - তর্পণ শেষ করে ৯০,০০০ টাকা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্ব ভারতীকে দান করেন। এই সব ঘটনার ভেতর দিয়ে অনুভব করি যে, চীন ও বারতের মিলন সূত্র আবার সুদৃঢ় করে কবি কত বড় কাজ করে গেছেন। চীনবাসী এ বিষয়ে তাঁদের কর্ত্তব্য বোধের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন! সেই গৌরবের উপযুক্ত হতে যেন সচেষ্ট হই।